ফেসবুকে যখন দু'বছর আগে আমরা মাত্র দু'জন সদস্য মিলে 'সাহিত্যধারায় কাব্যডালি' গ্রুপটা শুরু করি, তখন ভাবিনি যে শীঘ্রই এতজনকে পাশে পাব। পরে সদস্যদের অনুরোধেই, গ্রুপের নামটা বদলে রাখা হয় 'পাণ্ডুলিপি'। আজ এই ই-পত্রিকা প্রকাশের সাথে সাথে আমরা আরও একধাপ এগিয়ে গেলাম। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আমাদের সহযোগী সদস্যদেরই...

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

মাসিক ই-পত্রিকা

কলম হাতে

শিব প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রসূন কান্তি ভট্টাচার্য্য, অসিত চট্টোপাধ্যায়, পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস, প্রণব কুমার বসু এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা···

প্রকাশনাঃ

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.:   লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

প্রথম সংখ্যা

জুন ২০১৯

©Pandulipi

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

দূরের জানালা

ইং ১৯৭৬ সালের শেষ দিকে, হাওড়ার সাঁত্রাগাছি কেদারনাথ ইন্সটিটিউশনের চারজন ছাত্র শুধু কলম হাতে বেরিয়ে পড়েছিলেন একটা ‘লিটল ম্যাগাজিন’ বা ক্ষুদে পত্রিকা প্রকাশ করার আশে, যাতে করে তাঁরা তাঁদের লেখা পৌঁছে দিতে পারবেন সমস্ত শ্রেণীর পাঠকদের কাছে। তাঁদের না ছিল অর্থবল, না ছিল মুদ্রণ সংক্রান্ত কোন অভিজ্ঞতা। কিন্তু সেই চার জোড়া চোখে ভরা ছিল শুধু এগিয়ে যাবার স্বপ্ন, আর তাঁদের একমাত্র সম্বল ছিল সুতীব্র মনবল।

কথায় বলে ‘ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়’, এঁদের জীবনেও ঠিক তেমনই কিছু ঘটেছিল, যা থেকে উৎপত্তি হয় একটা নতুন ‘লিটল ম্যাগাজিন’ বা ক্ষুদে পত্রিকার, যার নাম দেওয়া হয়েছিল ‘গুঞ্জন’। সাঁত্রাগাছিতে সেই সময় ‘লিটল ম্যাগাজিন’এর অভাব ছিল না, কিন্তু তবু এই কিশোরদের মনে হয়েছিল – কোথায় যেন একটা বিরাট ফাঁক রয়ে গেছে। তাই কারুর সাথে প্রতিযোগিতা না করে, সবার সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে, শুধুমাত্র সাহিত্যকে সৌখিনতা থেকে জীবনমুখীতার দিকে টেনে আনতেই ব্যস্ত ছিলেন ওই চারজন কিশোর। ওঁরা এক নতুন ধারার জন্ম দিতে চেয়েছিলেন, যার খুব প্রয়োজন ছিল সেই সময়।

বলা বাহুল্য যে, মহাকালের নিয়মে, যেকোনো জিনিস যেমন ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে এবং একদিন আবার বিলীন হয়ে যায়, ‘গুঞ্জন’ এর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু জীবিকার চাপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়া এই কিশোররা চিরকালই সুসাহিত্যের সমাদর করে এসেছেন। এঁদেরই একজনের উদ্যোগে আজ আবার ‘গুঞ্জন’এর নবজন্ম হল।

দূরের জানালা

‘গুঞ্জন’এর জন্মবৃত্তান্ত অসমাপ্ত থেকে যায়, যদি এই চারজন (তখনকার) কিশোরের নাম না বলা হয়, এঁরা ছিলেনঃ শ্রী অমিত সান্যাল, শ্রী ভোলানাথ বসু, শ্রী অরুণ ঘোষ এবং শ্রী প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। আগেই বলেছি এই কিশোরদের ছিল অফুরন্ত উৎসাহ, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কারুরই ছিলনা কোন অভিজ্ঞতা। তাই সেই সময়, অনেকের কাছেই তাঁরা সাহায্যপ্রার্থী হিসাবে উপস্থিত হন। নিজেদের ব্যস্ত কর্মজীবনের মাঝেও সর্বতভাবে এঁদের সাহায্য করেছিলেন তিনজন মহানুভব ব্যক্তি। এঁদের মধ্যে দু’জন – শ্রী শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রী অমিতানন্দ মৈত্র, ছিলেন সাঁত্রাগাছি কেদারনাথ ইন্সটিটিউশনএর তৎকালীন স্বনামধন্য শিক্ষক মহাশয়। আর তৃতীয় জন ছিলেন শ্রী শ্রীকুমার ভাদুড়ি, যিনি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। শ্রীকুমার বাবুর সাথেও শিক্ষক ছাত্রেরই সম্পর্ক ছিল এই চারজন কিশোরের, তবে তা ছিল বিদ্যালয়ের বাইরে। তাঁর তৎকালীন গৃহেই শুরু হয়েছিল ‘গুঞ্জন’এর সমস্ত পরিকল্পনা, সেটিই পরবর্তী কালে ‘গুঞ্জন’ পত্রিকার অফিসে পরিণত হয়।

আজ এত বছর পরে, কালস্রোতে বিলুপ্ত ‘গুঞ্জন’ পত্রিকাকে পুনরুদ্ধার করতে পেরে, আমরা খুবই গর্ববোধ করছি। তখনকার ধাঁচেই ‘কভার পেজ’টাও তৈরি করলাম। শুধু সময়ের পরিবর্তনের সাথে তাল রেখে আমরা আপাতত ‘ই-ম্যাগাজিন’ প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

বিনীতা

রাজশ্রী দত্ত – সম্পাদিকা

শরণ্যা মুখোপাধ্যায় – সহ-সম্পাদিকা ■

কলম হাতে

স্মৃতিচারণ – দূরের জানালা পৃষ্ঠা ০২
রাজশ্রী দত্ত ও শরণ্যা মুখোপাধ্যায়

প্রবন্ধ – করুণার সিন্ধু বিদ্যাসাগর পৃষ্ঠা ০৬
শিব প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কবিতা – আদিখ্যেতা পৃষ্ঠা ০৮
প্রণব কুমার বসু

কবিতা – আগামী প্রজন্মকে বাঁচাও পৃষ্ঠা ০৯
মৌসুমী লাহিড়ী

রম্য রচনা – সোহাগ পৃষ্ঠা ১০
পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস

কবিতা – ছায়া পৃষ্ঠা ১৪
প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)

প্রবন্ধ – শিব দুহিতা নর্মদা পৃষ্ঠা ১৬
ডাঃ অমিত চৌধুরী

কবিতা – সেদিন দুজনে পৃষ্ঠা ২১
শরণ্যা মুখোপাধ্যায়

রম্যরচনা – গুরুদেব যখন নেতা পৃষ্ঠা ২২
অসিত চট্টোপাধ্যায়

কলম হাতে

কবিতা – ভোট — পৃষ্ঠা ২৬
প্রসূন কান্তি ভট্টাচার্য্য

কবিতা – কলঙ্কিনী — পৃষ্ঠা ২৭
রিতা বিশ্বাস

ধারাবাহিক গল্প –ছায়া-কায়া — পৃষ্ঠা ২৮
রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

কবিতা – ...বার্ড স্যাংচুয়ারী — পৃষ্ঠা ৩০
সরজিৎ মণ্ডল

গল্প – নীল মাছি — পৃষ্ঠা ৩১
অভিজিৎ চ্যাটার্জী

শ্রদ্ধাঞ্জলি

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহাশয় এবং গুঞ্জনের অন্যতম পথ নির্দেশক শ্রী অমিতানন্দ মৈত্র গত ২৬ শে মে সজ্ঞানে অমরধামে গমন করিয়াছেন। শিক্ষকতার পাশে পাশে স্যার ছিলেন একজন প্রথিতযশা নাট্যকার, এবং ওনার বহু প্রবন্ধ ও কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা স্যারের কাছে চিরঋণী... ঈশ্বরের কাছে স্যারের অমর আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ...

করুণার সিন্ধু বিদ্যাসাগর

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন করুণার সিন্ধু। দীনজনের প্রতি তাঁর অপার করুণা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, “বিদ্যাসাগরের কারুণ্য বলিষ্ঠ – পুরুষোচিত। এই জন্য তাহা সরল ও নির্বিকার”। তাই দেখি কার্মাটাড়ে এক মেথরজাতীয়া স্ত্রীলোক ওলাউঠায় আক্রান্ত হলে বিদ্যাসাগর স্বয়ং তার কুটিরে উপস্থিত থেকে স্বহস্তে তার সেবা করতে কুণ্ঠিত হননি। বর্ধমানে বাসকালে তিনি তাঁর প্রতিবেশী ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত দরিদ্র মুসলমানগণকে আত্মীয় নির্বিশেষে সেবাযত্ন করেছিলেন।

শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁর সহোদরের জীবন চরিতে লিখেছেন, “অন্নসত্রে ভোজনকারিণী, স্ত্রীলোকদের মস্তকের কেশগুলি তৈলাভাবে বিরূপ দেখাইত। অগ্রজ মহাশয় তাহা অবলোকন করিয়া দুঃখিত হইয়া তৈলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রত্যেককে দুই পলা করিয়া তৈল দেওয়া হইত। যাহারা তৈল বিতরণ করিত তাহারা পাছে মুচি, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি অপকৃষ্ট জাতীয় স্ত্রীলোক স্পর্শ করে এই আশঙ্কায় তফাত হইতে তৈল দিত, ইহা দেখিয়া অগ্রজ মহাশয় স্বয়ং উক্ত অপকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য স্ত্রীলোকদের মাথায় তৈল মাখাইয়া দিতেন”।

১২৭২ বঙ্গাব্দে বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। অনাবৃষ্টির কারণে ধান এবং অন্যান্য শস্য ফলেনি। কৃষকের ঘর ধানশূণ্য। বুনোওল ও কচু

খেয়ে গ্রামবাসী দিনপা্ত করছিল। লেফ্টেনাণ্ট গভর্নর বীডন সাহেবকে দিয়ে গ্রামে গ্রামে অন্নসত্র খোলালেন বিদ্যাসাগর। আর নিজ জন্মভূমি বীরসিংহ ও তৎসংলগ্ন গ্রামগুলিতে অন্নসত্র স্থাপন করলেন তিনি। কুড়িটি পরিবার প্রত্যহ সিদা নিতে লজ্জা পেতেন। সেজন্য বিদ্যাসাগর তাদের নগদ টাকা দিতেন। যে সব ভদ্রপরিবারেও বস্ত্র ছিল না, তারা প্রকাশ্যে বস্ত্র নিতে লজ্জা পেত। তাই বিদ্যাসাগর প্রায় দুই হাজার টাকার বস্ত্র গোপনে বিতরণ করেন। যারা ভিক্ষা করতে আসতেন, বিদ্যাসাগর তাদের কাউকে পঞ্চাশ টাকা, কাউকে একশ টাকা, আবার কাউকে বা দু'শ টাকা দান করতেন।

মফস্বল পরিভ্রমণকালে পথের মধ্যে কোন পীড়িত, চলৎশক্তিহীণ ব্যক্তি পড়ে থাকতে দেখলে তাকে পালকিতে চাপিয়ে নিজে পায়ে হেঁটে গিয়েছেন। কার্মাটাড়ে কলেরা মহামারীর সময় সাঁওতাল পল্লীতে, বর্ধমানে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীদের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেছেন। শুধু ওষুধ নয়, পথ্য দিয়েছেন। রোগীর শিয়রে বসে সেবা করেছেন। জাত বা ধর্ম মানেননি কোনদিনই। পীড়িত বর্ণহিন্দু, সাঁওতাল তথা মুসলমান, যে কোন মানুষকেই সেবা করে গেছেন নির্বিচারে। রোগীদের চিকিৎসার জন্য নিজের খরচে স্থাপন করেছেন ডিসপেনসারি। সেই ডিসপেনসারিতে যারা অসুস্থতাবশত আসতে পারত না, করুণাময় বিদ্যাসাগর তাদের ঘরে ওষুধ পৌঁছে দিয়েছেন। দরিদ্র, পীড়িত, অসহায় মানুষই ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বর।

ঈশ্বরের ত কোন জাত নেই! ■

হাসির ফোয়ারা

আদিখ্যেতা

প্রণব কুমার বসু

পল্টুমেসোর পিসতুতো ভাই
নন্দলালের জ্যাঠা
সকাল সন্ধ্যা ছড়ায় নাকি
ঘরের মাঝে আঠা...

আটকে গিয়ে হাওয়াই চটি
পরে যেদিন জেঠি
সবাই মিলে দৌড়ে আসে
হাতে নিয়ে লাঠি...

চশমাখানা নাকে তুলে
ভীষণ জোরে হেসে
লাফিয়ে গিয়ে ঘরের কোণে
একটুখানি বসে...

বদ্যি এসে নাড়ি দেখে
যেইনা গেল চলে
জ্যাঠামশাই দু'হাত তুলে
জেঠিকে নেয় কোলে ।

■

আগামী প্রজন্মকে বাঁচাও

মৌসুমী লাহিড়ী

হে ভারতসন্তান জাগো এবার
সংস্কার করো তুমি পুনর্বার।
বহুকাল হয়নি সমাজ সংস্কার
সকলের চোখে স্বচ্ছ পরিষ্কার।
হেনেছে আঘাত ওরা মূর্তিতে
উল্লাস করেছে তারা স্ফূর্তিতে।
ভেঙেছে কিছু পাথর শুধুই
ছিলেন না তিনি মূর্তিতে ওই।
পারবে না ওরা তাঁকে ভাঙতে
পারেনি আরেক সাগর গড়তে।
হে শিক্ষিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবী,
হে বাংলার সমাজসেবী,
দেখো সময় রয়েছে এখনো,
নিজ বিবেকের কথা শোনো।
সুশিক্ষা সুবুদ্ধি সুসংস্কার দিয়ে
ভাবো ভবিষ্যৎ সমাজ নিয়ে।
নিজের বিবেককে জাগাও,
আগামী প্রজন্মকে বাঁচাও।

সোহাগ

পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস

ওহ্! এই গরমে প্রেম দেখেছো! পাউরুটির ওপর থেকে মাখন সরিয়ে ফেলা যাবে, কিন্তু শরীর থেকে অন্তর্বাস? নৈব নৈব চ। এইতো সকালে একটু বেরিয়ে ছিলাম, ঘুরে এসে গেঞ্জি খুলতে গিয়ে সমস্যা। অতি কষ্টে তাঁকে যখন শরীর থেকে বার করে আনা হলো, তিনি একবারে লেচির আকার নিয়ে বের হলেন। মনে হচ্ছে সহধর্মিনী যেন কড়াইয়ে তেল চড়িয়ে বসে আছেন, এখনই লুচি ভাজবেন।

আর মধ্যবিত্ত বাঙালীকে দেখ? এত সময় জ্ঞান ভাবা যায়? সব এক সময়ে এক সাথে অফিস যাবে। আরে বাবা গরম কাল একটু আগে অফিস গেলে তো আখেরে নিজেরই লাভ। বড় বাবুর কথা শুনতে হবে না। অফিসের ঠান্ডা হাওয়ায় সহকর্মীর সাথে সমাজের অবক্ষয় নিয়ে কিংবা গতকালকের ভারত পাকিস্তানের ম্যাচ নিয়ে পর্যালোচনা করা যাবে। নিদেনপক্ষে আসার পথে সুবাসিত গন্ধে একদৃষ্টিতে যে রমনীর পীঠস্থান চোখ দিয়ে চাটতে চাটতে অফিসে ঢুকলেন সেটা নিয়ে বয়ে যাওয়া সমাজের আলোচনা চলতে পারে। সব থেকে বড় পাওনা এক দেড় ঘন্টা কম বৌয়ের

হালচাল

মুখ ঝামটা শুনতে হবে। এত অ্যাডভান্টেজ! না, সেই রাইট টাইম বলে একটা কথা আছে না, একসাথে বেরিয়ে কোলাকুলি করতে করতে অফিস যাওয়াতেই যেন পাংচুয়ালিটির সঠিক পরিচয়।

কোনমতে বাসে উঠে প্রবীণ নাগরিকের একটা সিট পেলাম। পেছন থেকে কে বলে উঠলো, "ল্যাংড়া, ভাগ চাষ আর হলো না? এই জন্যই তো বলি পরের জমিতে বীজ ফেলিস না।" এটা অবশ্য কলকাতার ঐতিহ্য। নোবেল কমিটি অনেক খোঁজ করেছিলেন এই "প্যাঁক" শব্দের আবিস্কারককে নোবেল প্রাইজ দেওয়ার জন্য। মৃত ব্যক্তিকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয় না। তাই সেটা হাত ছাড়া হয়ে গেল। এটাও বাঙালীর এক বড় দুঃখের কারণ।

চলতে চলতে গায়ে দুচার ফোঁটা বৃষ্টির জল। ওপরে তাকিয়ে দেখলাম নাহ্ বাসের ছাদ ঠিক আছে। বাইরে কটকটে রোদ। তবে! পাশে দণ্ডায়মান ছেলেটির কনুই বেয়ে ঘাম ঝরছে। বললাম – ভাই ঘাম ঝরছে। সপাটে উত্তর – এই গরমে ঘাম ঝরবে নাতো কি মুক্ত ঝরবে। বললাম – না একটু মুছলে হত না, গায়ে ঘাম পড়ছে। বলল – পকেট থেকে রুমালটা বার করে দিন। দিলামও। বলল – এটা আমার না। সে কি! আমি তো তোমার পকেট থেকেই বার করে দিলাম। বলল – না এটা আপনি পাশের ভদ্রলোকের পকেট থেকে বার করেছেন, আমারটা আমার পকেটেই

আছে। এ তো উল্টো বিপদ। এখন ঢোকাই কি করে। বললাম – ভাই তুমি আমার সিটটাতে বোস। আমি সামনের স্টপেজএ নেমে যাব। যাব অবশ্য আরো দুটো স্টপেজ, কিন্তু এই ঘাম বৃষ্টি আর পকেটমার অপবাদের থেকে তো রেহাই। নামতে গিয়ে আর এক বিপদ। কন্ডাক্টর পারলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। কোনমতে নেমে আগে দেখে নিলাম পরনের প্যান্টটা ঠিক আছে কিনা!

যে অফিসে কাজে গিয়েছিলাম তা সেরে বের হবার আগে ভাবলাম নিজে একটু হাল্কা হয়ে বের হই, এই গরমে পেটে দু বোতলের ওপর জল কলকল করছে। এক টেবিলের ওপর এক বৃদ্ধ ঢুলছেন, গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম – দাদা, আপনাদের ওয়াশরুমটা কোনদিকে? গম্ভীর ভাবে বললেন, কই দেখান। কি দেখাব? যেখানে যাবেন সেটা। কি মুশকিল! কি নিয়ম এখানে! এত লোকের সামনে .....? রীতিমত ঘামছি, ভাগ্যিস অফিসের চা দেবার ছেলেটি চলে এসেছিল। জানতে চাইল কি হয়েছে? বললাম আমার দুর্দশার কথা। সে সঠিক রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে বলল – আমাদের ঘোষদা এ-মাসেই রিটায়ার করবেন, কানে কম শোনেন। কোনমতে দৌড়ে গিয়ে কম্ম সেরে রাস্তায় নামলাম।

ফিরতি পথের বাস ধরব বলে দাঁড়িয়ে আছি। একটু দূরে চৌপথির মোর অব্দি হেঁটে গেলে অবশ্য অনেকগুলো রুটের

বাস পাওয়া যেতে পারে। তবু আশায় দাঁড়িয়ে যদি বাস আসে। আমার সাথে এক প্রেমিক প্রেমিকাও দাঁড়িয়ে। টাক চড়চড় করছে বাসের দেখা নেই। প্রেমিকটি তার প্রেমিকাকে বলো উঠলো চলো ‘মরে’ যাই, প্রেমিকার উত্তর ‘মরে’ গেলে হাঁটতে হবে। বলে কিরে? ‘মরে’ গেলে হাঁটতে হবে? বুঝলাম ব্যাপারটা। মনে মনে বললাম – তোমরা থাক আমিই মোড়ে যাই।

মোড়ে পৌছতেই দেখি একটা বাস আসছে, কন্ডাক্টার চিল্লিয়ে যাচ্ছে – সিট খালি, সিট খালি। সামনে এসে ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে চিৎকার করছে – একদম বেঁধে, সিনিয়র সিটিজেন, সিনিয়ার সিটিজেন। একেবারে জামাই আদর করে তুলে নিল। মনে মনে ভাবলাম, এমন ভালো কন্ডাক্টারও আছে তাহলে! যাক একটু ফাঁকায় বসে ফেরা তো যাবে।

এতো দেখছি আর এক যন্ত্রণা। প্রতি ষ্টপেজে কন্ডাক্টার এমনভাবে প্যাসেঞ্জার ডাকছে মনে হচ্ছে যেন নুতন বউ রাগ করে তাল গাছে চড়ে বসে আছে, নামলে পরে আদর করে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। যাওয়ার সময় যে রাস্তা চল্লিশ মিনিটে গেছি, ফেরার পথে সেই রাস্তাই নিল এক ঘন্টা। কোন মতে বাড়ি ফিরে জামা কাপড় ছেড়ে গামছা পড়ে ফ্যানের নিচে পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম। সহধর্মিনী এক গ্লাস লেবুর সরবত এনে দিলেন। সরবত খেয়ে নিদ্রালু চোখে মনে মনে বললাম – "কোলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে।" ■

মনের কোণে

ছায়া

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)

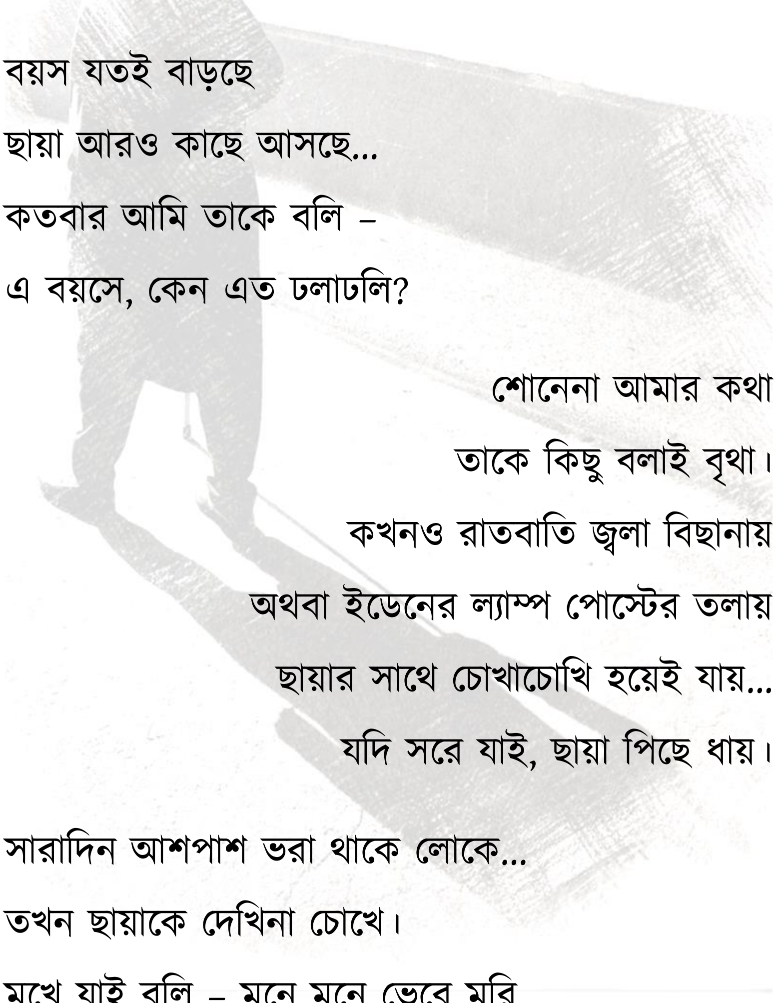

বয়স যতই বাড়ছে
ছায়া আরও কাছে আসছে...
কতবার আমি তাকে বলি –
এ বয়সে, কেন এত ঢলাঢলি?

শোনেনা আমার কথা
তাকে কিছু বলাই বৃথা।
কখনও রাতবাতি জ্বলা বিছানায়
অথবা ইডেনের ল্যাম্প পোস্টের তলায়
ছায়ার সাথে চোখাচোখি হয়েই যায়...
যদি সরে যাই, ছায়া পিছে ধায়।

সারাদিন আশপাশ ভরা থাকে লোকে...
তখন ছায়াকে দেখিনা চোখে।
মুখে যাই বলি – মনে মনে ভেবে মরি,
ছায়া কোনো সুদূর পানে দিল কি পাড়ি!

মনের কোণে

সন্ধ্যায়, সহসা আমাকে অবাক করে
আবার যখন সে আসে ফিরে
পৌরুষের অহংকারে মনে মনে ভাবি
আমাকে ছেড়ে, তুই আর কোথায় যাবি!

পরক্ষণেই ভয় হয়, যদি সত্যিই চলে যায়
কোনোদিন কোন এক বৈতরণীর মোহানায়...
যেখানে যাবার অনেক রাস্তা, অনেকেরি জানা আছে...
কিন্তু একবার চলে গেলে, কেউ আর ফেরেনা কাছে।■

গুঞ্জন আপনাকে পৌছে দিতে পারে সারা বিশ্বে...
যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

“গঙ্গে চ যমুনে চৈ গোদাবরী সরস্বতী।
নর্মদা সিন্ধু কাবেরী জলেস্মিন সন্নিধিং কুরু।।”

জল শুদ্ধির এই মন্ত্রে যে সাতটি নদীর নাম আছে তাদের অন্যতম নর্মদা। ভগীরথ গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনার বহু আগেই নর্মদা জীবের কল্যানে মর্তে আবির্ভূতা হয়েছেন। নর্মদা নদীর উৎসস্থল অমরকণ্টক। কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে এই অমরকণ্টকের উল্লেখ আছে। তখন অবশ্য এর নাম ছিল আম্রকুট। তাঁর বিবরণী থেকে জানা যায় যে অনেক আম গাছ ছিল এখানে। সেই জন্যই হয়তো এই নামটি এসেছে। আম গাছ অবশ্য এখনো আছে, তবে কালের প্রবাহে আম্রকুট নামটি পরিবর্তিত হয়ে অমরকণ্টক হয়ে গিয়েছে।

ট্রেনে বিলাসপুর থেকে পিন্ড্রা হয়ে অমরকণ্টক যাওয়া যায়। অথবা বিলাসপুর থেকে সরাসরি সড়কপথেও এখানে আসা যায়। এখানকার প্রধান উৎসব নর্মদা জয়ন্তী।

আনন্দ স্বরূপিনি

সরস্বতী পূজোর ঠিক দুদিন পরে, মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে নর্মদা মর্তে আবির্ভূতা হন। এটি সতীর একান্ন পীঠের একটি পীঠ। এই মন্দিরের কাছেই আর একটি সতী পিঠ আছে। সেই জায়গাটির নাম শোনমুড়া। বায়ু পুরাণে আছে, সৃষ্টির আদিতে শিবের প্রলয় নাচনের সময় তাঁর শরীর থেকে যে ঘাম উৎপন্ন হয় তার থেকেই নর্মদার সৃষ্টি। যেহেতু, শিবের দেহ থেকেই সৃষ্টি তাই নর্মদা শিবের কন্যা। বিন্ধাচল, মেকল ও সাতপুরার এই তিনটি পর্বতের মধ্যস্থানে অমরকণ্টক অবস্থিত। মেকল পর্বত নর্মদার মর্তে আগমনের গতিকে নিজের কোলে স্থান দিয়েছেন। তাই নর্মদার অপর নাম মেকল কন্যা। 'নর্ম' অর্থাৎ আনন্দ, 'দা' অর্থাৎ দান করেন যিনি। অতএব, যিনি জীবকে আনন্দ, সুখ, শান্তি ইত্যাদি দান করেন, তিনিই নর্মদা।

ঋষি মার্কন্ডেয় বনবাস কালে যুধিষ্ঠিরকে নর্মদার মাহাত্য বর্ণনা করেছিলেন। তা মহাভারতের বনপর্বে পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, "সরস্বতী নদীতে তিন দিন স্নানে, যমুনাতে সাতদিন স্নানে আর গঙ্গায় একবার মাত্র স্নানে যে পুণ্য পাওয়া যায়, নর্মদা দর্শন মাত্রই তাই হয়। নর্মদা স্নানে গত সাত জন্মের ক্লেদ ধুয়ে যায় এবং গঙ্গা মর্ত্যে আসার পাঁচ হাজার বছর পর থেকে গঙ্গা তাঁর

মাহাত্য হারাবেন। আর নর্মদা স্বমহিমায় বিরাজিতা হবেন।” মার্কন্ডেয় মুনির এই উক্তিটি পরে লোকনাথ ব্রহ্মচারীও সমর্থন করেন।

নর্মদার ঘাটে ঘাটে শিব মন্দির আছে। আর নর্মদার জলে আছে শিবলিঙ্গ, সেগুলি আজও পাওয়া যায়। নর্মদার জলে স্নান করা পুণ্যের কাজ। বিশেষ করে অমরকণ্টকে, ওঁঙ্কারেশ্বরে এবং ভৃগুক্ষেত্রে। যেখানে নর্মদা সাগরে মিলিত হয়েছেন, সেই স্থানের মাহাত্য দ্বিগুণ। একমাত্র নর্মদা নদী যার পরিক্রমার বিধি আছে। ৩৭০০ কিলোমিটার পথ নদীর পাড় ধরে বা সড়ক পথে শুরু করে বৃত্তাকারে ঘুরে শুরুর জায়গায় ফিরে আসাই নর্মদা পরিক্রমা। এই পরিক্রমাটি একটানেও করা যায়। তাকে বলে জলহরি পরিক্রমা বা খণ্ড খণ্ড করেও করা যায়। তাকে বলে খণ্ড পরিক্রমা। তবে অমরকণ্টকের কাছে কিছু জায়গা চার রাত তিন দিন ঘুরে এসে আবার অমরকণ্টক মন্দিরে ফিরে আসাটাকেই বলে পঞ্চকোশী পরিক্রমা। এই পরিক্রমার পথে পড়বে মাঈ কী বাগিয়া, শোনমুঢ়া, চক্রতীর্থ, কবির চবুতবা, আরিন্ডী সঙ্গম, কপিলধারা, দুধধারা, ধূনীপানী, শম্ভধারা, দুর্গাধারা, অমরেশ্বর, জলেশ্বর ইত্যাদি শিব মন্দিরগুলি। এটি একটি অভিনব অভিজ্ঞতা।

আনন্দ স্বরূপিনি

এই নর্মদার ঘাটে ঘাটে অনাদি কাল থেকে বহু ঋষি, মহর্ষি তপস্যা করে এখানকার বায়ু মণ্ডলকে প্রভাবিত করে রেখেছেন। অনেক উচ্চকোটির মাহাত্মার দর্শন আজও পাওয়া যায়। শোনা যায় সৃষ্টির আদিতে ওঙ্কার নাদ।

ঋষি মার্কণ্ডেয় এই নর্মদাকে মানুষের সঙ্গে পরিচিত করান এবং পরিক্রমার বিধি নির্ণয় করেন। প্রতিটি প্রানীকে কোন না কোন সময় কোন না কোন জন্মে প্রারব্ধ ক্ষয়ের জন্য নর্মদা তটে আসতেই হয়। মার্কণ্ডেয় সে কথাই যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন।

আদি শঙ্করাচার্য থেকে শুরু করে এ যুগের পরিক্রমাবাসীরা প্রায় সকলেই মা নর্মদার কৃপা পেয়ে ধন্য হয়েছেন। মা নর্মদার অস্তিত্ব অনুভব করেছেন। জলরূপী নর্মদা এক ঘাট থেকে আরেক ঘাট পেরিয়ে সাগরে মিলিত হয়েছেন। ঠিক যেমন মূলাধার থেকে কুল কুন্ডলিনী শক্তিচক্র ভেদ করতে করতে আজ্ঞাচক্র হয়ে সহস্রারে মিলিত হয়েছে। প্রত্যেক পরিক্রমাবাসীর কোন না কোন সময় এই অভিজ্ঞতা হবে। ঋষি মার্কণ্ডেয়, মার্কণ্ডেয় পুরানে এই কথা উল্লেখ করেছেন।

নর্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা রুদ্রদেহদ্বিনিঃসৃতা।
তারয়েৎ সর্বভুতানি স্থাবরানি চরানি চ।।
মহাদেবাধিদেবেন ঈশ্বরেন মহাত্মনা।

আনন্দ স্বরূপিনি

লোকনাথস্তহিতার্থায় মহাপুণ্যাবাতারিতা ।।
মানসং বাচিকং পাপং স্নানন্নেশ্যতি কর্মজম।
রুদ্রদেহদ্বিনিস্ত্রান্তা তেন পুণ্যতমাহি সা।।

রুদ্র দেহ নিঃসৃতা মা নর্মদা সারিত সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। তিনি স্থাবর অস্থাবর সব কিছুকেই ত্রাণ করেন। দেবাদিদেব মহাদেব সর্বভূতের কল্যাণ কামনায় মহাপুণ্যা মা নর্মদাকে মর্ত্যে আনয়ন করেছেন। মা নর্মদার পুণ্য জলে স্নান করলে মানুষের মানস, বাচিক ও কর্মজ পাপ সমূলে বিনষ্ট হয়। রুদ্র দেহ থেকে নিঃসৃত বলে মা নর্মদা ইহজগতে পূণ্যতমা। ■

সেদিন দুজনে

শরণ্যা মুখোপাধ্যায়

আমাদের মধ্যকার প্রেতাত্মাগুলি
কখনো কখনো বেরিয়ে আসে
ঘন মেঘকালে, অন্তরালে। একটি উৎযাপনে,
একটি সৎকার যেন গ্রন্থিত হয়ে থাকে আজীবন।

আমাদের মধ্যকার প্রেতাত্মাগুলি
ঠিক জেগে ওঠে, বিরলে, বিরামে তারাদের।
বিষন্ন অজ্ঞতায়, অবিমিশ্র অবহেলায়
আমাদের উৎযাপনগুলি, আমাদেরই সৎকার হয়ে ওঠে।
এমৎ কালে,
অন্ধের অশ্রুর মত, মুখর শংসা ভেদ করে
একটি আমিকে দেখা যায়, যার হাতে নির্বিষ ইহকাল
পরকাল হয়ে দেখা দেয়। আমাদের আমিগুলি তখন
দেখেছি খুব জেগে ওঠে, ঝিমিয়ে আবার, মনঘরে
ভাই—বোন, স্বামী—স্ত্রী, পুষ্পপত্র, সংসার—সন্দেশ—
নিরুদ্দেশ—জন্মান্তরে
সুখ, স্বস্তি, শান্ত বেঁচে থাকার ঐশ্বর্য্যের বাইরে...

কে—ই বা দাবী করে, সর্বদাই, 'অন্ধকার' আর 'বসিবার'
জন্য লাগে রক্তমাংসের বনলতা সেন? ■

প্রহসন

গুরুদেব যখন নেতা

অসিত চট্টোপাধ্যায়

মহামন্ত্রী করুণা দেবী অত্যন্ত রেগে গেলেন। "এ সব কি হচ্ছে? এইমাত্র ক্যুরিয়ারে চিঠি পেলুম গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে 'মর্মর মহাপুরুষ পার্টি' পরমান্ন ভবন ঘেরাও করতে আসছে। চিঠিটা স্বরাষ্ট্র সচিবকে পাঠালুম ইমিডিয়েট অ্যাকসন নোট দিয়ে। তিনি বলছেন সাদা কাগজ পাঠিয়েছেন কেন ম্যাম! লেখা কি উবে গেল? বললুম পুলিশ কমিশনারকে ফোন করুন। মিছিল যেন পরমান্ন ভবনের ধারে কাছে ঘেষতে না পারে। আর পুলিশ পারমিশন ছাড়া মিছিল বেরোয় কি করে?" স্বরাষ্ট্র সচিব জানালেন – "'মর্মর মহাপুরুষ পার্টি' পারমিশন চেয়ে নাকি পুলিশকে চিঠি দিয়েছিল। সেই চিঠি বলে ওরাও আমাকে একটা সাদা কাগজ পাঠিয়েছে।" করুণা দেবী আরও রেগে গেলেন। "ধাষ্টামো হচ্ছে? 'মর্মর মহাপুরুষ পার্টি' কি ম্যাজিক কালি দিয়ে চিঠি লিখেছে যে লেখা ভ্যানিস হয়ে যাচ্ছে!"

পুলিশ ঘিরে রেখেছে পরমান্ন ভবন। বিদ্যাসাগরের মর্মর মূর্তি ভাঙ্গার প্রতিবাদে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, স্যার আশুতোষ, ক্ষুদিরাম, ঋষি অরবিন্দ, মাতঙ্গিনী

হাজরা এবং আরো অনেকে সংঘবদ্ধ। মর্মর পার্টি অতি সূক্ষ্ম অবয়বে গেটে প্রহরারত রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল থেকে কমিশনরকে অদৃশ্য থেকে চড়, থাপ্পড়, গাঁট্টা, কাতুকুতু অহিংস অস্ত্রে ঘায়েল করে পরমান্ন ভবনের একেবারে ভেতরে ঢুকে পড়ল। কেউ দেখতে পাচ্ছে না, কে মারছে, কে কাতুকুতু দিচ্ছে। করিডোরে দেখে মহাপুরুষদের মর্মর মূর্তিগুলো লাইন দিয়ে রাখা। এগুলো আবার কে আনল! সরাতে গিয়ে দেখা গেল সব মর্মর মূর্তি উধাও। আশ্চর্য কাণ্ড!

মহামন্ত্রী করুণা দেবী কনফারেন্স রুমে তখন পদস্থ অফিসার ও বিদ্দজ্জনদের সঙ্গে বৈঠক করছিলেন। আকস্মিক তাঁদের কেউ অদৃশ্য কারোর চড় খেয়ে গালে হাত বোলাতে বোলাতে, কেউ গাঁট্টা খেয়ে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে, কেউ কাতুকুতুর চোটে হাসতে হাসতে মহামন্ত্রীর অনুমতির অপেক্ষা না করেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ভি আই পি দের মহামন্ত্রীর কনফারেন্স রুম থেকে বের করে দিয়ে, গুরুদেবের নেতৃত্বে চেয়ারগুলো দখল করল মর্মর পার্টির মহাপুরুষরা। হঠাৎ, ওরে বাপরে বলে ককিয়ে উঠলেন করুণা দেবী। পিঠে যেন গদাম করে লাঠির ঘা পড়ল। "এটা হোল অহিংসা লাঠি চার্জ।" এই কথা বলে হাসতে হাসতে, সামনে গুরুদেবের পাশের খালি চেয়ারে এসে বসলেন মহাত্মা গান্ধী, হাতে লাঠি। মহাপুরুষদের মর্মর মূর্তিরা সামনের চেয়ারে এসে বসেছে। কথা বলছে। করুণা দেবী ঘাবড়ে গেলেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ মর্মর পার্টির পক্ষ থেকে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙ্গার প্রতিবাদে এক

স্মারকলিপি পেশ করলেন। রাগপ্রধান করুণা দেবী এবার লঘু সুর ধরেছেন। “আপনারা এখানে কেন?”

সেই সময় ফোন বাজল। ফোন করেছেন মহামন্ত্রীর গুপ্ত সহায়ক। “ম্যাম কার্জন পার্কের মার্ক্স এঙ্গেলস থেকে শুরু করে রবীন্দ্রসদনের রবীন্দ্রনাথ, টালিগঞ্জের উত্তমকুমার, ময়দানের গোষ্ঠ পাল... সব মর্মর মূর্তি উধাও। সব বেদি খালি।” করুণা দেবী ঘামছেন। ভীত কণ্ঠে বললেন, “ওঁরা সব এখানে, আমার সামনের চেয়ারগুলোতে বসে আছেন, নড়ছেন, চড়ছেন, কথা বলছেন।”

ঘর নিস্তব্ধ। গুরুদেব নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে বললেন, ‘বিদ্যাসাগর কলেজে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভূলুণ্ঠিত হোল। ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এর আগেও নকশালরা আমাদের মূর্তিগুলোকে আবার মেরে বিপ্লব করত। এত বছর পরে আবার সেই কাণ্ড। আমাদের নিরাপত্তা দিতে পারনা, তুমি কেমন মহামন্ত্রী? তোমার পুলিশ গোয়েন্দারা করে কি?” করুণা দেবী আমতা আমতা করে বললেন, “কেন্দ্রীয় বাহিনী তো আছে, তারাই বা কি করেছে? ওদের তো কিছু বলছেননা।” সঙ্গে সঙ্গে পিঠে লাঠিচার্জ। সামনে বসে গান্ধীজী হাসছেন। “এই তো বলছিলে এখানে আইন-শৃংখলা খুব ভাল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর দরকার কি? এখন ওদের ঘাড়ে দোষ চাপান হচ্ছে? তোমরা যেমন আঞ্চলিক পার্টি, আমরাও আঞ্চলিক পার্টি। আমাদের রক্ষা করা তোমাদের দায়, রাজ্য সরকারের।”

করুণা দেবী ফোন তুলে পুলিশ কমিশনারকে বললেন, "এখানে টেনস সিচুয়েশন, ইমিডিয়েট অ্যাকশন নিন।"

"ফোর্স পাঠাব?"

"না না পুলিশ ফোর্স কিছু করতে পারবেনা। এক ঝাঁক নামকরা ওঝাদের তুলে আনুন। ওঝা ফোর্স পাঠান এক্ষুনি। পরমান্ন ভবন ভূত কবলিত।"

ব্যস, যায় কোথায়! থাপ্পড়, গাঁট্টা, কাতুকুতু সব একসঙ্গে। "মহাপুরুষদের তুমি ভূত মনে কর? ভূতের ভবিষ্যৎ তো মর্মর মূর্তিতে গিয়ে ঠেকে। সেটারও নিরাপত্তা দিতে পারনা! ছি ছিঃ..."

করুণা দেবী কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, "এখন কি উপায় গুরুদেব?"

"শোন নিরাপত্তার অভাবে আমরা সবাই স্বর্গে ফিরে যাচ্ছি, বেদি খালি করে। তুমি সর্বদলীয় বৈঠক ডাক। আর ডাক ধান্দাবাজ বিদ্বজনদের। সব দল থেকে আর বিদ্বজনদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে হতচ্ছাড়া, অপগণ্ড, নেতা নেত্রী আর বিদ্বজনদের নিয়ে ঐ সব খালি বেদিগুলোতে জলজ্যান্ত বসে পড়। দেরি করলে কি হবে জানতো?

"আজ্ঞে হাঁ।"

"কি?"

"অদৃশ্য চড়, থাপ্পড়, কাতুকুতু..." বাপুজী মিটিমিটি হাসছেন দেখে করুণা দেবী ঢোক গিলে বললেন, "ওরে বাপরে, আবার আছে বাপুর লাঠিচার্জ..." ■

ভোট

প্রসূন কান্তি ভট্টাচার্য্য

রক্তে রাঙা ভোটের পরব শেষ...
কত যে লাশ হিসাব কে নেবে তার ?
তুমি জিতে প্রিয়ার চুমু খাও,
নেতা, আমি ঘুমাতে চাই এবার।

নুন আনতে পান্তা ফুরায় ঘরে,
তাইতো আমি বুথ দখল করি।
পয়সা নিয়ে জেতাই তোমায় ভোটে,
পুলিশের গুলিতে আমিই মরি।

আগে ছিলাম তোমার উল্টো দিকে,
তখনো লক্ষ্য ছিল ভোটে জেতা।
তাকে হারিয়ে জিতলে তুমি আজ,
এবার আমি ঘুমোতে যাই নেতা।

ঘুম পাড়ানি মাসি ডেকে বলে,
তোর দলকেই ভোট দিয়েছি বাছা।
না দিয়ে আর উপায়টা কি বল?
তোদের হাতেই আমার মরা বাঁচা।

উন্নয়ন

এবারের ভোট অনেক শান্তিপূর্ণ,
আগের বারের চেয়ে অনেক কম
লাশ পড়েছে। এবার ভোট উৎসবে,
বিরোধীরা মুছে গেছে একদম।

এবার ভোটে মানুষ দেয়নি ভোট,
ভোট দিয়েছে শুধুই উন্নয়ন।
উন্নয়নের জয় জয়কার দেখে,
হাসছে পাহাড়, সমতল আর বন। ■

হৃদয়ের গভীরে

কলঙ্কিনী

রীতা বিশ্বাস

মোহিত হৃদয়ে মহাকাব্যের পাণ্ডুলিপি
রাত জাগে নির্ভরতার ওমে...

বৃষ্টিভেজা হিমেল রাতে
হাজার বছরের প্রতীক্ষা শেষে
প্রেমরাজ্ঞী প্রেয়সীর অনুভূতি ছুঁয়ে
বাঁধা পড়েছিলেম...

সমাজের নিদানে হয়েছি কলঙ্কিনী
তবুও মুছিনি জানো! ! !
সিঁথির লাল সিঁদুরের অসমাপ্ত কাহিনী... ■

মনের খেলা (ধারাবাহিক)

ছায়া-কায়া

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

(১)

ঘরের ভিতরে কৃত্রিম আঁধার প্রকৃতির সব উজ্জ্বলতাকে ব্যর্থ করে একাকী বসে আছে , এ যেন স্রোতের বিপরীত টান। সব বাঁধন ছিন্ন করে স্বেচ্ছায় নির্বাসন নেওয়ার ভয়ঙ্কর প্রয়াস। এই ভয়ঙ্কর প্রয়াসকে সঙ্গী করে, জয় নিজের সকল পরাজয়কে ভুলে আপন হৃদয়কে আঁধারের হোমাগ্নিতে ভস্ম করছে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে। রঞ্জনার প্রতিও তার আর সেরকম টান নেই। রঞ্জনার ভালবাসার যেই দুটো বাহু সারাক্ষণ জয়কে মোহে ঘিরে রাখত, তা যেন শিকল ভাঙা পাখির মতো মোহ কাটিয়ে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

ব্যবধানের আকারটা এতো বেশি হয়ে গেছে, যে তাদের দুজনের শরীর ও মনের মাঝে একটা ইটের পাঁচিল মাথা উঁচু করে বিদ্রুপ করে। জয় একা একা পশ্চিম কোণের ছোটো ঘরটায় সারাদিন ছবি আঁকা নিয়ে মগ্ন থাকে। আর রঞ্জনা থাকে ঠিক তার পাশের ঘরটায়। জয় রঞ্জনাকে আজকাল সামনে দেখলেই কিরকম বিরক্ত বোধ করে, অকারণে তার ওপর রাগ দেখায়। এমনকি সে নিজের দেখাশুনার দায়িত্ব থেকেও রঞ্জনাকে বিরতি দিয়েছে। জয়ের সব দায়িত্ব এখন ভোলাদার ওপর।

মনের খেলা (ধারাবাহিক)

(২)

আজ সকাল থেকে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। রঞ্জনা আজ আর অফিসে যেতে পারেনি। সারাটা বেলা একা একা সে কি করবে? কি করে কাটাবে? কিছুই বুঝতে পারছিল না। তাই উদাস মনে ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। তার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া মুক্ত ধারা, বারি ধারার সাথে যেন একাকার হয়ে যাচ্ছিল। কত পুরনো স্মৃতি ভেসে উঠছিল তার মনের মাঝে। সেই সেদিনেরই কথা যেন। রঞ্জনা বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে ফুটবল খেলা দেখতে গিয়েছিল। যদিও ফুটবল খেলা দেখার কোন ইচ্ছাই ছিলো না তার। তবু সেই নাম না জানা খেলোয়াড়টার খেলা দেখে মুগ্ধ হয়েছিল রঞ্জনা। নিজেই আলাপ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। কবে যে এই ক্ষণিকের আলাপচারিতা গভীর প্রেমের রূপ নেয়, তা ফুটবল চ্যাম্পিয়ান জয় আর রঞ্জনা নিজেরাই বুঝে উঠতে পারে নি।

প্রথম আলাপের তিন বছর পর, উভয়ের বাড়ির পূর্ণ সম্মতিতে বিবাহ হয় তাদের। দাম্পত্য জীবনে তারা খুব সুখী দম্পতি ছিল। রঞ্জনার মধ্যে একটা অদ্ভুত আকর্ষণীয় সৌন্দর্য আছে। সেই সৌন্দর্য জয়কে দৈহিক তৃপ্তির থেকেও মানসিক স্বস্তি দেয়। সব খেলার অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছিল তার স্ত্রী রঞ্জনা। কিন্তু সেই রঞ্জনা আজ জয়ের কাছে চোখের বালি। একটা ঘটনা বদলে দিয়েছে তাদের সম্পর্ককের রসায়নটা। আজও সেই ঘটনাটা মনে করলে ভয়ে সিটিয়ে ওঠে রঞ্জনা।

...ক্রমশ

ডঃ সেলিম আলি বার্ড স্যাংচুয়ারী

সরজিৎ মণ্ডল

একদিকে মান্ডভীকে লুকিয়ে জল থেকে কোমর বাঁচিয়ে
পা নেংচে জোড়হাতে ম্যানগ্রোভের সারি, আর অন্যদিকে
ডালপালায় কিচিরমিচির পাখিদের পসরা সাজিয়ে
ঘন চুলের মতো পাতায় অজানা সবুজ সতেজ গাছ-গাছালির দল,
স্বাগতম জানাচ্ছিল আমাদের, তাদের সেই মজার দুনিয়ায়।
ভাটার টানের জল ধুয়ে দিচ্ছিল পা। অতিথি আমরা,
হাঁটছিলাম, ডঃ সেলিম আলি বার্ড স্যাংচুয়ারীর ভেতর।

হারিয়ে গিয়েছিলাম; লাল নীল, সাদা কালো,
হলুদ সবুজ আর বেগুনী পাখিদের মেলাতে।
রামধনুর রং সত্যিই ফ্যাকাসে ও দূরের মনে হয়েছিল,
পাখিদের কলরব বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হোয়ে
আমাদের বোঝাতে চাইছিল তাদের রাজ্যের
অনাবিল আনন্দে বেঁচে থাকার সার্থকতা।

ধমনী-শিরার মতো আঁকা-বাঁকা খাঁড়িতে
নৌকায় ভাসছিলাম। কাক বক চিল মাছরাঙা
আর পানকৌড়ি, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে
বিজ্ঞের মতোই অবাক হচ্ছিল আমাদের দেখে !
কেবল মাছেরা মজা করে লাফ দিয়ে দিয়ে জলের উপর
পাল্লা দিচ্ছিল আমাদের ডিঙির সাথে, নির্ভয়ে। ■

পরাবৃত্তি

নীল মাছি

অভিজিৎ চ্যাটার্জী

কাল থেকেই জল নামতে শুরু করেছিল। আজ অনেকটাই কমে গেছে। তাও কোমর জল। জলে বেশ টান আছে নদীর দিকে। এই জলে নামারও যথেষ্ট ঝুঁকি আছে। বেসামাল হলেই, সোজা নদীতে গিয়ে পড়বে, যেখানে ভয়ঙ্কর স্রোত টেনে নিয়ে যাবে মোহনায় বা সমুদ্রে। নেহাৎ যমের অরুচি না হলে জ্যান্ত ফিরে আসা সম্ভব নয়। আর যদি নদীতে নাও যায়, তবে এই কোমর জলের নীচে কি আছে কেউ জানে না, ওখানে কোথাও আটকে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে মারা পড়বে।

প্রায় সবাই মাইতিদের তিনতলার ছাদে আশ্রয় নিয়েছিল প্রায় চার দিন আগে। নদীর প্রকৃতি ও বেগ দেখে অভিজ্ঞরা বলেছিল – ‘আইজ রেতেই বান ডাইকবে হো, সাইবধান থিকো।’ কথাটা বলেছিল বুড়ো রামদাস। বয়স সত্তরের কোঠায়। ভাঙা-চোরা চেহারা, কোটরাগত চোখ, শীর্ণ শিরা ওঠা হাত, মাঝারি উচ্চতা, একমাথা সাদার ওপর কালোর ছোঁয়া চুল। মুখের বলিরেখা যেন উপগ্রহ থেকে তোলা নদীর ছবির মতো আঁকাবাঁকা।

পরাবৃত্তি

বুড়োর মুখের কথাই ফলে গিয়েছিল। সেদিন রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে ছিল, ঘরে জল ঢুকছিল নিঃশব্দে, চুপিসারে চোরের মতন। ফুলমনি তার তিনমাসের বাচ্ছা নিয়ে, মরদ নিয়ে শুয়ে ছিল। ঘুম যখন ভাঙল জলের স্পর্শে, তখন ঘরে একবুক জল। দরজাটা আটকে গিয়েছিল, কেউ বেরোতে পারেনি। পরদিন ওদের লাশ ভেসে গিয়েছিল সবার চোখের সামনে দিয়ে। মাটির দেওয়াল ভেঙে পড়তেই মুক্তি মিলেছিল তিনটি নিস্প্রান দেহের।

রামদাসও সেদিন মারাই যেত, ঠিক সময় মত দয়াল ওকে ঘর থেকে টেনে বের করে এক বুক জল ঠেলে মাইতিদের তিনতলার ছাদে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর আজ চারদিন অনাহারে। ভেজা গামছা-কাপড়ের জল চুষে চুষে খেয়ে রয়েছে। মাইতি বাবু এলাকার ডাকসাইটে বড়লোক হলেও, আজ তাঁর কাছেও এক দানা খাবার নেই। সবার সাথে তিনিও অভুক্ত, অনাহারে ক্লিষ্ট।

হায় রে ভাগ্য! যাঁর বাড়িতে প্রতিদিন তিরিশটা করে পাত পড়তো, নিত্য দিন যাঁর বাড়িতে অতিথি আপ্যায়ন হতো, সাঁঝের বেলায় দোতলায় বড় হল ঘরটাতে মদের আসর বসত; আজ সেই লোকটা ও তাঁর পরিবার চারদিন ভুখা, নির্জলা। চাল, ডাল সব নীচের তলায়, থৈ থৈ জলের তলায়।

পরাবৃত্তি

চারদিনের মাথায় হঠাৎ একটা নৌকা এলো, হলুদ রঙের। চোঙ নিয়ে হাঁকাহাঁকি করছিল শুনশান গ্রামে। ‘আপনারা কে কোথায় আছেন, চিৎকার করে জানান দিন। আমরা খাবার, ওষুধ, জল এনেছি।’ প্রথমটা বোঝা না গেলেও, যখন বোঝা গেলো তখন নৌকা অনেকটা দূরে চলে গেছে। সবাই কেমন হতবাক। ঠিক এমন সময় রামদাস – যে এতদিন কথা বলেনি, লাগাতার বৃষ্টিকে ভ্রুক্ষেপ করেনি; দয়াল কতবার জিজ্ঞাসা করেছে, ‘হেই বাপ তুর কি হইল বল দিকি? মুখে রা কাইড়ছিস না?’...

রামদাসের বউ সীতামনি মরেছিল অনেক বছর আগে। সেবারেও এমনি বান ডেকেছিল গাঁয়ে। রামদাসের তখন মধ্য যৌবন, বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। সেবারেও জল ঢুকেছিল রাতের বেলায়। বউ, ছেলে দয়াল আর মেয়ে লক্ষ্মীকে নিয়ে এলোপাথাড়ি চলতে গিয়ে আচমকাই হাত ছিটকে পড়ে গিয়েছিল সীতামনি। বছর দশেকের লক্ষ্মী ছিল দয়ালের কোলে, আর তেরো বছরের দয়াল তার বাপের কসি ধরেছিল। সীতামনি হাত ছিটকে যেতেই দয়াল ঝুঁকে পড়ে সীতামনিকে ধরতে গেল। ঠিক তখনই বুকের মধ্যে চেপে ধরা লক্ষ্মীর বাঁধন আলগা হয়ে গেল। আর সবাই মিলে জলের মধ্যে পড়ে গেলো। বন্ধনহীন সেই গভীরতম অন্ধকারে

পরাবৃত্তি

চারটি প্রানী একসাথে গহীন জলে হাবুডুবু খেতে লাগল আর অলক্ষ্যে নিয়তি হা হা করে হাসতে লাগল। এক কথায়, একটা গোটা পরিবার শেষ হয়ে যেতে লাগল...

কিন্তু মানুষ ভাবলেই তো সব কিছু শেষ হয় না। আড়ালে বিধাতা পুরুষ মুচকি হাসতেই রামদাস ভুস করে জলের ওপর ভেসে উঠেছিল। হাঁ করে বাতাস থেকে সমস্ত অক্সিজেন শুষে নিচ্ছিল। একটানা বৃষ্টির ঝমঝম আওয়াজ আর খলখল করে তোড়ে বয়ে যাওয়া জলের শব্দ ছাড়া সেদিন পৃথিবীতে আর কোন শব্দ ছিল না।

এইমাত্র রামদাস পায়ের তলায় একটু মাটি পেলো। হাঁপাচ্ছিল, হাপরের মতো শ্বাস টানছিল। হতচকিত হয়ে বুঝতে পারছিল না, এখন সে কি করবে? হঠাৎ পায়ের তলার মাটিটা প্রবল শক্তিতে নড়ে উঠতেই রামদাস জলের মধ্যেই লাফিয়ে উঠল। ভালো করে ঠাওর করার জন্য পা দিয়ে দেখতে লাগল। তারপর পায়ে কি একটা আটকাতেই, জলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তুলে নিয়ে এলো লক্ষ্মীর মৃতদেহটা। একটু আগেও যার শরীরটা গরম ছিল, শ্বাস নিচ্ছিল, সেটা এখন একদম স্তব্ধ একটা দেহ।

রামদাস ধুতিটা খুলে নিলো। নিথর লক্ষ্মীকে বাঁধল নিজের শরীরের সাথে। তারপর শুধু ডুব আর ডুব। পাগলের মতো খুঁজতে লাগল বউ আর ছেলেকে। তারপর যখন ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়ল, রামদাস একটা গাছের গুড়ি ধরে দাঁড়িয়েছিল সারা রাত, পিঠে মৃত লক্ষ্মী।

যথারীতি নিয়ম মেনে সকাল হলেও, সূর্য উঠল না। সারা রাত জলে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছিল সে। সেকি ঠাণ্ডা না স্বজন বিয়োগের

দমফাটা যন্ত্রণা! হঠাৎ শুনতে পেলো, ‘হেই বাপ, হেইই বাপ।’ সচকিত হয়ে রামদাস এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলো না। মনে মনে ভাবলঃ দয়ালের গলা না! আবার শব্দ উঠল, ‘হেই বাপ, হেইই বাপ ইদিক তাকা না, ইদিকে গাছের ওপর, এই যে আমি ইখানে - তাকা তাকা তাকা...’। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখল রামদাস – দয়াল, তার ছেলে, গাছের ডাল ধরে চুপ করে বসে আছে। চিৎকার করে সে ডেকে উঠল – দ-য়া-ল! প্রথমটায় গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরলনা। আবার গলার শক্তি সঞ্চয় করে ডাকল দ-য়া-ল! ক্ষীণ শব্দ হলেও যখন চরাচরে জলের একটানা মৃদু বয়ে যাওয়া কুল কুল শব্দ ছাড়া কিছু ছিল না, তখন ওই সামান্য আওয়াজ দয়ালের কান পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

তারপর কিছু সময়ের ব্যবধানে চরম উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে, পিতা পুত্রের মিলন হল। স্ত্রী সীতামনি আর মেয়ে লক্ষ্মীকে চিরকালের মত হারিয়ে, ছেলেকে আঁকড়ে নতুন জীবন শুরু করেছিল রামদাস।

এর মাঝে আর কখনো যে বন্যা হয়নি, তেমন নয়। বরং, বন্যা এই গ্রামে বর্ষার অবশ্যম্ভাবী সঙ্গী। কিন্তু এবারের বর্ষা রামদাসকে বড় ব্যাকুল করে তুলেছিল। স্মৃতির সিন্দুকে লালিত বীভৎস বিরহ যন্ত্রণা তাকে সারা জীবন কুঁড়ে কুঁড়ে খেয়েছে।

পরাবৃত্তি

আজ কটা দিন কারোর পেটে কিছু পড়ে নি, মায় জলটুকুও নয়। নরেন বেরার ছেলেটার দেখাদেখি কয়েকজন বন্যার জল খেয়ে ভেদ বমি হয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। এত গুলো লোক, কিন্তু টুঁ শব্দটি কারোর মুখে নেই। যেন মনে হয়, অনাদি কাল থেকেই এরা সবাই নির্বাক! বোবা, কালা জন্তুর মতন... জন্তু তবুও আর্ত-চিৎকার করে, আঁচড়ায়, কামড়ায়; কিন্তু মাইতি বাড়ির ছাদের এই অস্থায়ী বাসিন্দারা বোধ হয় সেটুকুও ভুলে গেছে...

এই মাত্র নরেন বেরার ছেলেটা মারা গেল। কোথাও কোন কান্নার রোল নেই। একটা নীল মাছি মুখের উপর বসছে আবার উড়ে যাচ্ছে। কখনো হাঁ করা মুখের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে, আবার কখনো বেরিয়ে আসছে। নীল ডানার মৃদু গুঞ্জন উঠছে। এবার পালানি বুড়ির গায়েও মাছিটা বসেছে। ঐতো মাইতির গায়েও বসল। একটানা হাওয়া বয়ে যাওয়ার শব্দ, মাছির গুন গুন শব্দ, চারপাশটা কেমন কালো কালো দেখাচ্ছে। রামদাসের চোখের সামনে লক্ষ্মীর আবছা মুখটা ভেসে বেড়াচ্ছে। সীতামনির সোহাগী হাসি কেমন যেন অনুরনিত হয়ে বার বার ফিরে আসছে। রামদাস মাথা নাড়াচ্ছে। ত্রাণ নিয়ে নৌকাটা দূরে – বহুদূরে চলে যাচ্ছে। কেমন অন্ধকার লাগছে। অপসৃয়মান নৌকাটা ফেরাতে পারলেই মুক্তি, সবার মুক্তি। নীল মাছিটাকে একবার খুঁজল সে। নীলমণি সোরেনের নাকের ওপর বসেছে সেটা। দুর্বল শরীর নিয়েই রামদাস এবার উঠে দাঁড়ালো। সারা শরীরের শক্তি গলার মধ্যে নিয়ে ফ্যাসফ্যাসে আওয়াজে চিৎকার করে উঠল– 'হেই আমরা ইখানে

পরাবৃত্তি

এ... ইদিকে আইস কেনে, হেই বাবুরা ইদিকে আইস কেনে' - কোমরের গামছা খুলে নাড়াতে লাগল রামদাস। এবার সবাই উঠে দাঁড়ালো ও একসাথে চিৎকার করে উঠল। রামদাস ধূসর চোখে দেখতে পেলো – নৌকার অভিমুখ পাল্টেছে। জল কেটে কেটে এগিয়ে আসছে, আরও কাছে, আরও কাছে। ছাদের ভিড় তখন ছাদের কিনারায়। অদ্ভুত চঞ্চলতা সবার মধ্যে। ওরা খাবার দিচ্ছে। যে যতটা পারছে নিয়ে নিচ্ছে। ঠেলাঠেলি হচ্ছে, ওরা খাচ্ছে। নরেন বেরার বউ বিলাপ করে কাঁদছে।

রামদাস দেখতে পাচ্ছে সীতামনি কাছে এসেছে। কালো মুখের ওপর চারটে দাঁত বের করে, সেই অমলিন হাসিটা হাসছে। ছোট্ট ছোট্ট হাতে, লক্ষ্মী বাপের চুলের মুঠি ধরে টানছে। কারা যেন কথা বলছে... ক্রমশ সব কালো হয়ে যাচ্ছে... নীল মাছিটা মুখের ভিতর ঢুকছে, পেট পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। এবার শ্বাসনালীর উপর বসেছে। দম বন্ধ হয়ে এলো। কে যেন বলল – 'হেই বাপ উঠনা কেনে, চুড়া খাবো নি! হেই বাপ উঠনা কেনে, হেই বাপ............'

তারপর চরাচর থেকে সব শব্দ বিলীন হয়ে গেলো। নিঝুম, নিস্তব্ধ শীতল অন্ধকার নেমে এলো। রামদাস শেষ বারের মতো তাকিয়ে দেখল, কি যেন খুঁজল, শীর্ণ হাতখানি ওপরের দিকে উঠিয়ে কি যেন ধরতে চাইল। পেলো কি পেলো না, তা আর জানা হল না। রামদাস চির ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল। নীল মাছিটাকে আর দেখা গেলনা। ■

NIPUN™ SHIKSHALAYA

Oriental Method of Teaching

GROUP TUITIONS
English Medium

Accountancy, Costing for Professional Courses
B.Com., M.Com., XI & XII Commerce

I to X Maharashtra Board & CBSE

Courses on Specific Topics for X and XII

Small Batches
Individual Attention

Imparting Knowledge
Increasing Competitiveness

Head Office:
A-403, Yamunotri Apts.
Nallasopara (E), Dist.: Palghar
Maharashtra - 401209

E: nipunshikshalaya@gmail.com
M: +91 9322228683 | WhatsApp: +91 7775993977

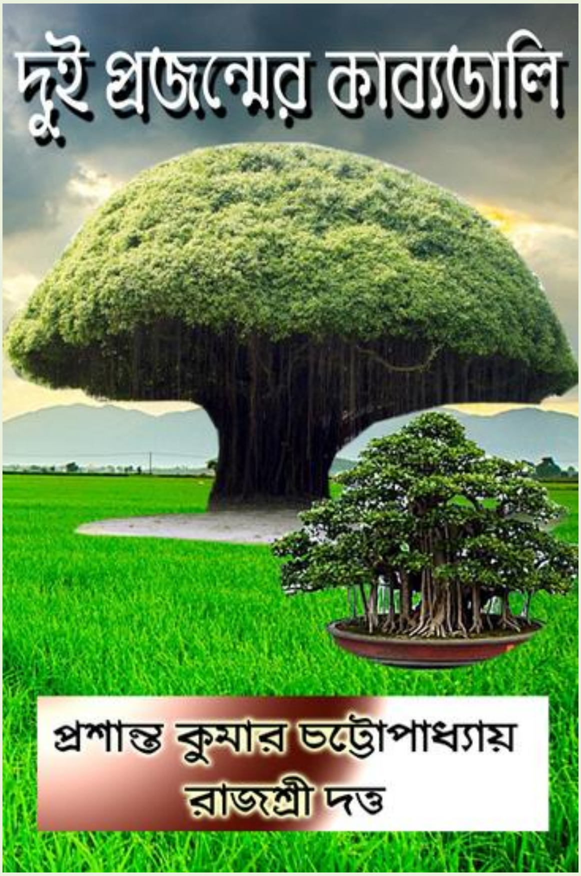

দুই প্রজন্মের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে, বর্তমানের কিছু চিত্র শুধু ভাষার মাধ্যমে একত্রে উপস্থাপন করেছেন দুই প্রজন্মের দুই কবি। আধুনিক কবিতা প্রেমীদের জন্য একটি অসামান্য কবিতা সংগ্রহ।

প্রাপ্তিস্থলঃ 1) www.flipkart.com

(Search Words: dui-projonmer-kabyadali)

2) E-mail: contactpandulipi@gmail.com

সবিনয় নিবেদন

'গুঞ্জন' কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা গুঞ্জনে দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের 'ই-মেল' এ (contactpandulipi@gmail.com) পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু'ট ফরম্যাট ই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও থাকা চাই। ছবির সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর 'পাণ্ডুলিপি' 'গ্রুপে'ত অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: জুলাই সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ২০ শে জুন, ২০১৯।